(DSE-1B) Unit-1

বীরাঙ্গনা কাব্যের শ্রেষ্ঠ পত্র : সোমের প্রতি তারা

'বীরাঙ্গনা' কাব্য একাদশ পত্রিকার নির্মাল্য। একাদশ পত্রিকার একাদশ নায়িকা। তাঁদের প্রত্যেকের প্রকৃতি পৃথক, ব্যক্তিত্ব পৃথক, সমস্যা পৃথক, আকৃতিও পৃথক। তাঁদের এইসব পার্থক্যের সমাযোজনে এ কাব্য বৈচিত্র্যময়। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে থেকে কোনো একটি পত্রকে যখন শ্রেষ্ঠ বলতে চাই, তখন সংশ্লিষ্ট নায়িকার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বগুণের মূল্যে পত্রটির মূল্যায়ন করি না, কারণ সে মূল্যায়ন তখন নায়িকার, কাব্যের মূল্যায়ন নয় তখন। বৈচিত্র্যের মধ্যে কোনো নায়িকার পত্রকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দিই কবির লক্ষ্য সে কতটা পূরণ করতে পেরেছে, কতটাই বা আলোকিত করে তুলেছে পৌরাণিক আধার, আর তার শিল্পায়নে কবিই-বা কতখানি দক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছেন ইত্যাদি বিবিধ-নিকষে বিচার করে।

'বীরাঙ্গনা' কাব্যের প্রাচীন পর্যালোচকেরা কিন্তু এই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজেছেন অন্য দিক থেকে। তাঁদের অধিকাংশেরই মনে হয়েছে এ কাব্যের শ্রেষ্ঠ পত্র জনার। আসলে কাব্যনামের 'বীরাঙ্গনা' কথাটির আক্ষরিক অর্থ তাঁরা ভুলতে পারেননি, তাঁরা দেখেছেন 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে কোনো নারীই অস্ত্র-হাতে লড়াইয়ের ময়দানে নামেননি, জনা ছাড়া আর কারও মধ্যে সংগ্রামের স্পৃহা পর্যন্ত নেই। জনাই কেবল তীব্র অপত্য বেদনায় স্বামীকে পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিতে উদ্দীপিত করে তুলতে চেয়েছেন। সুতরাং বীরাঙ্গনার বৈশিষ্ট্য যদি বিন্দুমাত্রও কারও মধ্যে থাকে, তিনি জনা। অতঃপর তাঁরা জনার মাতৃবেদনা, স্বামীর প্রতি যুগপৎ ক্ষোভ ও সমবেদনা, জনার বাকছল, তথ্যবিশ্লেষণী শক্তি, প্রতিবাদের অনমনীয়তা ইত্যাদি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন।

কিন্তু ভুললে চলবে না যে, রেনেসাঁসের শতকে অস্ত্রধারিণী রণরঙ্গিণী নারীর আদর্শ (model) প্রয়োজন ছিল না। রণনিপুণা নারীও যদি মানসিক দিক থেকে তমসাবৃত হন, যদি অসংখ্য কুসংস্কার আর অসার বিশ্বাসে আচ্ছন্ন থাকে তাঁর মন তবে মাইকেলের অভিধায় তিনি বীরাঙ্গনার সম্মান পাবেন না, মাইকেল মনে করেন কুসংস্কার আর অসার বিশ্বাসের অক্টোপাস থেকে যে নারীর মন মুক্তি পেয়েছে সে-নারীই বীরাঙ্গনা। তা যদি তিনি না-ই হবেন তবে 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে মাইকেল তাঁকে স্থান দিলেন কেন। তথ্যোপস্থাপনা এবং তার যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণে, ক্ষুরধার বাকবিস্তারে, প্রতিবাদের অনমনীয়তায় জনার ব্যক্তিত্বের দীপ্তি পাঠকমাত্রকেই অভিভূত করে। তবুও জনাকেই এ কাব্যের সকল নারীর মধ্যে সর্বাধিক মুক্তমনা, সর্বাধিক স্বাধীনচেতা ও সর্বাধিক সাহসিকা বলে মনে করি না।

স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ হলেও চিরাগত স্বামী-সংস্কার তাঁর মজ্জায়, কুল-নারী পরাধীনা — এই সংস্কারও তাঁর মধ্যে জগদ্দল, তাই কৃত কথার মধ্যেই তিনি লিখেছেন —

'গুরুজন তুমি,
পড়িব বিষম পাপ গঞ্জিলে তোমারে।
কুলনারী আমি, নাথ, বিধির বিধানে
পরাধীনা।'

— এই সংস্কার থেকে অনেকটাই মুক্ত জাহ্নবী, কিন্তু জাহ্নবীর প্রসঙ্গে সেটা বড় হয়ে ওঠেনা তিনি দেবী বলে, মর্ত্যসংস্কার তাঁর মধ্যে কোনোদিন ক্রিয়াময় ছিল না বলে। কেকয়ীকেও বাহ্যত সর্বসংস্কারমুক্ত বলে মনে হলেও পত্রের উপান্তে যখন লিখতে দেখি —

'না থাকে যদি পাপ শরীরে;
পতি-পদ-গতা যদি পতিব্রতা দাসী;
বিচার করেন ধর্ম ধর্মরীতি-মতে।'

'পাপ', 'ধর্ম', 'পতিব্রতা', 'পদগতা' ইত্যাদি শব্দ কেকয়ীর সংস্কার-জনক।

সর্বসংস্কারমুক্ত নারী এ কাব্যে অদ্ভুত একজনই — তারা। দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তিনি। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে চন্দ্র বৃহস্পতির কাছে বিদ্যাধ্যয়ন করতে এসে গুরুপত্নী তারার রূপযৌবনে আকৃষ্ট হন। তারার প্রচণ্ড আপত্তি সত্ত্বেও তাঁকে উপগমন করেন। তখন ক্রুদ্ধ তারা তাঁকে অভিশাপ দেন যে তিনি যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হয়ে যাবেন।

মধুসূদন তারাকে সৃজন করেছেন পুরাণের ঠিক বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর তারা চন্দ্রকে যেদিন প্রথম দেখেছেন সেদিনই তাঁর প্রেমে পড়েছেন। —

'যেদিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে, — ভাসিল যেন আনন্দ সলিলে।'

প্রথম দৃষ্টিতেই এ প্রেমসঞ্চারে তারা দ্রুত গিয়ে মুখ দেখলেন আয়নায়, বেণী বাঁধলেন, ফুলে ফুলে সাজালেন কুন্তলকুল, বনদেবীর কাছে গিয়ে অজস্র অলংকারে সাজালেন তাঁর যৌবন। — মুখে তো বলতে পারলেন না তাঁর ভালোবাসা, বলতে লাগলেন প্রাত্যহিক আচরণে। গুরুর প্রসাদ খান চন্দ্র, তারা তাই সুখাদ্যসামগ্রী এনে গুরুর উচ্ছিষ্ট পাতে রেখে দিতেন, হরীতকী স্থলে তিনি রেখে দিতেন পান, যে কুশাসনে চন্দ্র বসতেন তার তলে রেখে দিতেন সুগন্ধী ফুল। চন্দ্রকে শুতে হত তৃণাসনে, তাই তারা ঘাসের উপর আঁচলে যত্নে ফুল বিছিয়ে রাখতেন। গুরুর পূজার জন্য পুষ্প-চয়নে যেতে হত চন্দ্রকে। তারা আঁধার ভোরে উঠে ফুল তুলে রেখে দিতেন যাতে চন্দ্রের পুষ্পচয়নক্লেশ লাঘব হয়। প্রেমের এ সেবাময়ী রূপ তবু বুঝলেন না চন্দ্র, দিনের পর দিন পার হয়ে শেষ হল তাঁর বিদ্যাভ্যাসের কাল। তাঁর বিদায়ের প্রাক্কালে তারা আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না, দীর্ঘপত্রে চন্দ্রকে নিবেদন করলেন তাঁর হার্দ্য আকুতি।

সুতরাং সহজ ছিল না এ-কাজ। মনে মনে ভাবা আর মুখে বা পত্রে তা উচ্চার

করে বলার মধ্যে পার্থক্য অনেক। চিরাচরিত সংস্কারের অনেক বাঁধন – অনেক সংকোচ শরম কাটিয়েই এ সম্ভব। তারা তাঁর যে সংস্কার ও সংকোচ শরমের কথাও গোপন করলেন না তাঁর পত্রে —

'গুরুপত্নী আমি
তোমার, পুরুষরত্ন; কিন্তু ভাগ্যদোষে
ইচ্ছা করে দাসী হয়ে সেবি পা দুখানি।'

স্মৃতির কাছে তিনি অব্যাহতি চাইলেন যেন তাঁর মনে না পড়ে অতীত। যেন ভুলে যান ভবিষ্যৎ-ভাবনা। যেন মনে না পড়ে তিনি মাতৃসমা গুরুপত্নী আর প্রিয় তাঁর শিষ্যপ্রতিম। প্রিয়-আবাহনেও তিনি স্পষ্টতর বললেন —

"এস তবে প্রাণসখে; দিনু জলাঞ্জলি
কুলমানে তব জন্যে, — ধর্ম্ম, লজ্জা, ভয়ে!"

তথাকথিত সতীধর্মের সংস্কারকে ত্যাগ করলেন তিনি। মাতৃতুল্যা হয়ে পতি-শিষ্যের কাছে প্রেমনিবেদনে যে লজ্জা আছে তাকে ত্যাগ করলেন। এ অবৈধ প্রেমের পরিণতি সম্পর্কিত ভয়কে মনে স্থান দিলেন না। অতঃপর জানালেন চন্দ্রকে প্রথম কবে তাঁর ভালো লাগল, সে ভালোলাগার প্রকাশই বা হল কেমন, জানালেন চন্দ্রের কণ্ঠস্বর শুনে তাঁর কি ব্যাকুলতা জাগত, কেমন করে শুনতেন সে কণ্ঠস্বর। জানালেন গুরুপত্নী বলে চন্দ্র যখন তাঁকে প্রণাম করতেন তখন কি ভাবতেন তিনি। চন্দ্রপত্নী তারাদের প্রতি — রোহিণীর শুভকামনার প্রতি তাঁর অসূয়াবোধও তিনি গোপন করলেন না, গোপন করলেন না চন্দ্রপ্রেয়সী রূপে কল্পিত কুমুদ বা সরসীর প্রতি তাঁর বিদ্বেষও। সুগত বা অনাগত দিনের বক্তব্য জানিয়ে তারা প্রার্থনা করলেন —

'তুষেছ গুরুর মন সুদক্ষিণা-দানে;
গুরুপত্নী চাহে ভিক্ষা, — দেহ ভিক্ষা তারে।
দেহ ভিক্ষা ছায়ারূপে থাকি তব সাথে
দিবানিশি।'

স্মৃতি যে তাকে অব্যাহতি দেয়নি তা দেখছি এখানে 'গুরুপত্নী' শব্দের ব্যবহারে। আর এখানেই অনুভব করি তার সাহস ও সংস্কারমুক্ত মনের শক্তি, গুরুপত্নী হিসাবেই তিনি ভিক্ষা চাইছেন চন্দ্রের প্রেম। সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় তাঁর: 'নাহি কাজ বৃথা কুলমানে।' — 'কুলমান' বৃথা, সত্য শুধু প্রেম। প্রেমের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতেই তিনি প্রস্তুত। এই সর্বসংস্কারমুক্ত মন। এই সাহস এবং এ প্রত্যয়ই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূর্ত রূপ। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের আর কোনো নারীর মধ্যেই এমন সর্বসংস্কাররহিতা, এমন সাহস ও এমন অসাধারণ প্রত্যয় নেই।

কেউ কেউ বলেন, বৃদ্ধ স্বামীর কাছে আদর সোহাগে বঞ্চিত হয়েই নবযুবতী তারা চন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কেবল যাঁরা বলেন এ শুধু তাঁদেরই কল্পনা। এমন সহজ সমীকরণ মধুসূদন বা তাঁর তারা করেননি। লক্ষণীয় তারা স্বামী সম্পর্কে কোনো কথাই লেখেননি তাঁর পত্রে। চন্দ্রকে তিনি ভালোবেসেছেন এটাই তাঁর প্রথম ও শেষ কথা। কোনো অতৃপ্তি থেকে যদি তিনি ভালোবাসতেন সোমকে তবে সে ভালোবাসা সম্মানের হত না, হত না ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেরও উপযুক্ত প্রকাশ।

প্রচলিত সমস্ত সামাজিক সংস্কার যা কখনো ধর্মের নামে, কখনো প্রথার নামে, কখনো অন্যান্য কুলাচারের নামে যুগ যুগ ধরে নারীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, অনমনীয় আত্মপ্রত্যয়ে সে-সবের উপরে উঠে যে নারী নিজের আকাঙ্ক্ষার কথাটি অসংকোচে উচ্চারণ করতে পারেন তিনিই বীরাঙ্গনা। মধুসূদনের এই বীরাঙ্গনা-ভাবনার শিল্পিত শ্রেষ্ঠরূপ তারা।

যে পত্রের আলম্বন এ দেব চরিত্র, তা ঔচিত্যের সম্মান নিঃশেষে দাবি করে তবু সুলিখিত হয়েছে। বস্তুত পত্রিকা-কাব্য হিসাবেও এ অন্যতম। লক্ষণীয়, পত্রিকাটি শুরুই হয়েছে প্রথা ভেঙে। সম্বোধন আছে, কিন্তু বেশ নাটকীয়ভাবে এর সূচনা। পত্র হিসাবে এ অপরের উদ্দেশ্যে মনের কথারই লিপিচারিতা, তবু মাঝে মাঝেই লেখিকা হয়ে পড়েছেন আত্মমগ্ন। এতে তাঁর আত্মোন্মোচন যেমন জড়িমা ও উচ্ছ্বাসের মধ্যে দিয়ে পূর্ণতর পথ খুঁজেছে, তেমনি পত্রটিও কাব্য-নাটকে মিশে ছুঁতে পেরেছে পরমোৎকর্ষের মাত্রা।

এটিও অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা হয়েছে এ পত্রিকা, তবু শব্দক্ষেপণের কুশলী নিয়ন্ত্রণে এর উচ্চারণ হয়েছে বৈচিত্র্যময়।

'এস হে, তারার বাঞ্ছা! পোড়ে বিরহিণী
পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে!'

সরল আকুতিময় এ উচ্চারণের পাশাপাশি স্মরণ্য —

'মন-বিহঙ্গিনী
উড়িল পবন-পথে, ধরি আমি তারে,
তারানাথ! — তারানাথ? কে তোমারে দিল
এ নাম, হে গুণনিধি, কহ তা তারারে!'

বিস্ময়ের উচ্চারণমাখা এ উচ্চারণ নাটকীয় চমকে দীপ্ত। তবে অবরোধ-ভাঙা প্রেমিকার প্রকাশ-বেদনাই এ পত্রের উচ্চারণকে বেঁধে দিয়েছে নম্র মাধুর্য-আকুতিতে ভরা শব্দে শব্দে রোমান্টিকতারই এ এক নতুন আবিষ্ক্রিয়া। অমিত্রাক্ষরে এ-হেন আবিষ্ক্রিয়া মাইকেল আগে রচনা করেননি তা বলা যায় না, তবে অমিত্রাক্ষরের এ সাহসী পরীক্ষা, এবং সে পরীক্ষায় কৃতি-লক্ষ্য সফল।

যেমন বিষয়, তেমনি তার বিন্যাস শিল্প — দুই-ই যেন পরস্পরের মতো অভিন্ন। শিল্প সাধনার চিরকাঙ্ক্ষিত এই অভিন্নত্ব লাভ করেই তারার পত্র 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের শ্রেষ্ঠপত্রের মর্যাদাধিকারী।